আখ্যান আর আলোচনা — দৃষ্টিপ্রদীপ

সুতপা ভট্টাচার্য

এক

আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়, *দৃষ্টিপ্রদীপ*ও *অপরাজিত*-র মতোই, নায়ক-কেন্দ্রিক জীবনীপ্রধান উপন্যাস — অপুর কৈশোর থেকে যৌবন পর্যন্ত জীবনবৃত্তের কাহিনি যেমন *অপরাজিত*, *দৃষ্টিপ্রদীপ* তেমনি জিতুর কৈশোর থেকে যৌবন পর্যন্ত জীবনবৃত্তের কাহিনি। কিন্তু তা সত্ত্বেও, উপন্যাস দুটি যে একই গোত্রের নয়, তা বোঝা যায় কথনকৌশলের ভিন্নতা থেকে। *অপরাজিত*-তে সর্বজ্ঞ লেখকই কথক, *দৃষ্টিপ্রদীপ*-এর কথক — এর নায়ক জিতু, উত্তমপুরুষের জবানিতে কথিত এর আখ্যান। তাই *অপরাজিত*-র কথক-নায়ককে যেখানে দেখছেন ভিতর-বাহির উভয় তলেই, সেখানে *দৃষ্টিপ্রদীপ*-এর নায়ককে পাঠক দেখতে পান শুধু ভিতরের তলে বাইরের দিক থেকে তাকে দেখানো সম্ভবই নয়, মানুষ নিজেকে নিজে দেখতে পায় না বলে। *অপরাজিত*-তে অপুর প্রত্যক্ষণকে প্রত্যক্ষ করছেন লেখক, *দৃষ্টিপ্রদীপ* জিতুরই প্রত্যক্ষণ। জিতু চরিত্রটিকে বলা যায় প্রতিফলক চরিত্র (হেনরি জেমস্-এর ভাষায়), তারই চৈতন্য থেকে প্রতিফলিত হচ্ছে উপন্যাসের যাবতীয় ঘটনা এবং আলোচনা (ডিসকোর্স)।

আলোচনার দিকে এ উপন্যাসে বিশেষভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। তুলনায় জিতুর জীবনকাহিনি গৌণ। জিতুর অভিজ্ঞতাগুলি চিহ্নিত করতে চায় সেই বিশেষ আলোচনার বিষয়কে। মানুষের ধর্মবোধ, এককথায় বলা যায়, আলোচনার সেই বিষয়। ধর্ম যে মূলত একটি ক্ষমতাতন্ত্র, জিতু তার অতিকৈশোরের ছোটো ছোটো অভিজ্ঞতা থেকেই তা বুঝতে শেখে। বুঝতে শেখে সেই ক্ষমতাতন্ত্র থেকে উৎসারিত রাশি রাশি কুসংস্কার মানুষের স্বাভাবিক বুদ্ধিবৃত্তিকে চাপা দিয়ে রাখে কতটা। বালক জিতু অবাক হয়ে দেখেছে পরিবারের গণ্ডিতে নিষ্ঠাবান ধর্মাচরণ কীভাবে ধামাচাপা দিতে পারে শতশত মানবিক অন্যায়, দেবতার পূজা কীভাবে হয়ে দাঁড়ায় যেন দেবতাকে ঘুষ দেওয়া — ব্যাবসার সাফল্য অর্জন করে অর্থভাণ্ডার স্ফীত করার জন্য। আবার, বড়ো হয়ে চাকরি-জীবনে জিতু দেখে ধর্মকে অবলম্বন করেই ব্যাবসা গড়ে উঠছে, সরল বিশ্বাসী দরিদ্র জনসাধারণকে শোষণ করে ফুলে-ফেঁপে উঠছে বিলাসী মহান্তরা। একদিকে ক্ষমতাবান ধনীদের ধর্মপালনের জাঁকজমক, অন্যদিকে ক্ষমতাহীন দরিদ্রদের অসহায় ভক্তিবিশ্বাস — এই নিয়ে গোষ্ঠীগত ধর্মাচরণ। এর থেকে সম্পূর্ণ পৃথক ব্যক্তিগত এক ধর্মবোধ জিতুর অনুভবে আছে আবাল্য। চা-বাগানে অতিবাহিত শৈশবজীবনে জিতু খ্রিস্টান মিশনারিদের সংস্পর্শে এসে যিশুকে ভালোবাসতে শিখেছিল। যিশুই ছিলেন তার কাছে ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি। বড়ো হয়ে সে বুঝেছে হিন্দু বা খ্রিস্ট — যে-কোনো প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের মধ্যেই আছে একটা ক্ষমতার চাপ। সব ধর্মের বাইরে জিতু এক বিরাট দেবতাকে জেনেছে, যে দেবতার উপলব্ধি ঘটে প্রকৃতির সৌন্দর্যের নিবিড় আস্বাদনে, বন্ধনহীন প্রেমের অসীম বেদনায়। সংসারের অঙিনার বাইরে দাঁড়িয়ে জিতু সে ঐশ্বরিক উপলব্ধি পায়

যদিও, কিন্তু তাই বলে সংসারের বন্ধনে ধরা দিতে সে পিছু-পা হয় না। দায়িত্ব কাঁধে নিয়ে, দারিদ্র্যের সঙ্গে নিয়ত সংগ্রাম করে দিন কাটলেও তার বুকের ভিতরে সে উপলব্ধি থাকে অনির্বাণ।

দুই

জিতুকে তুলনা করতে ইচ্ছে হয় *চতুরঙ্গ*-র শচীশের সঙ্গে। শচীশেরও ছিল এক অন্বেষণ, আর নির্জনে থেকে কোনো এক উপলব্ধির সঞ্চার নিয়ে সেও ফিরে গিয়েছিল কাজের জগতে — ব্যক্তিগত ছোটো সংসার না পাতলেও সে জায়গা নিয়েছিল সর্বজনীন বড়ো সংসারের আঙিনায়। এইরকম একটা মিলের দিক থাকলেও দুটি উপন্যাসের অমিলের দিকটাই বিরাট। সদাজাগ্রত ক্ষুরধার আত্মসচেতনতা নিয়ে শচীশ একের পর এক কর্মের পথ ভক্তির পথ জ্ঞানের পথ নিজে নির্বাচন করেছে। জ্যাঠামশাইয়ের সঙ্গ অথবা লীলানন্দ স্বামীর সঙ্গ তার নিজস্ব নির্বাচন। দামিনীর আবির্ভাব তার জীবনে আপতিক হলেও দামিনীর চলে-যাওয়া আবশ্যিক হয়েছে তারই সাধনার ঘাত-প্রতিঘাতে। কিন্তু জিতু তার জীবনের পথে চলতে-চলতে যা কিছু পায় সবই আপতিক, সে-সব অভিজ্ঞতার সমীক্ষণ থেকে গড়ে ওঠে তার ধর্মচেতনা। কিছুই তার নির্বাচন নয়। এমনকী মালতীকে বিবাহ-না-করা কিংবা হিরণ্ময়ীকে বিবাহ করার মধ্যেও একান্তভাবে তার নিজস্ব নির্বাচন নেই।

আপতিক এই বিরূপ সংসার তার অতিতুচ্ছ খুঁটিনাটি নিয়ে মূর্ত হয়ে উঠেছে *দৃষ্টিপ্রদীপ*-এ কীভাবে? পল্লিপ্রেমিক বলেই যে-বিভূতিভূষণ সকলের পরিচিত, *দৃষ্টিপ্রদীপ*-এ তিনি গ্রামের এ কোন ছবি তুলে ধরলেন? সেই একই বাংলার গ্রাম নিশ্চিন্দিপুর আর আটঘরা অপুর আর জিতুর দেশ, কিন্তু কী আকাশ-পাতাল পার্থক্য। জিতু তার গ্রামের বর্ণনা দিচ্ছে এইভাবে :

> রাস্তায় বেজায় ধূলো, পুরনো নোনা ধরা ইটের বাড়িই অধিকাংশ, বিশেষ কোনো শ্রীছাঁদ নেই — পথের ধারে মাঝে মাঝে গাছপালা, সে-সব গাছপালা আমি চিনিনে ...।
>
> জিতুর চোখে সে দেশ :
>
> বড় নীচু, আঁটাসাঁটা, ছোট বলে মনে হয় যে-দিকেই চাই চোখ বেধে যায়, হয় ঘরবাড়িতে, না হয় বাঁশবনে আমবনে। ... এখানে সব যেন দীনহীন, সব যেন ছোট মাপকাঠির মাপে গড়া।

জিতু অবশ্য পাহাড়ি অঞ্চলের সঙ্গে তুলনায় দেখছে সমতলকে — কার্শিয়ং-এর যে পাহাড়ি অঞ্চলে তার ছোটোবেলা কেটেছে। শুধু তাইই নয়, স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে স্বাধীনতার মধ্যে আনন্দের মধ্যে যেখানে কেটেছে তার সেই পাহাড়ি অঞ্চলের শৈশব, সেখানে, বাবার চাকরি যাবার পর নিঃসম্বল অবস্থায় দেশে গ্রামে তাদের বাস করতে হয়েছে — নিদারুণ দারিদ্র্যের মধ্যে, অপমানের মধ্যে, পরাধীনতার মধ্যে। অবস্থাগত এই ভিন্নতার কারণেও তার দেশ তার চোখে ভালো-না-লাগাই স্বাভাবিক। কিন্তু এসব হল আখ্যানগত দিক। আটঘরা যে নিশ্চিন্দিপুরের মতো গ্রাম নয়, তার মূল কারণটা আলোচনাগত।

এটা লক্ষ করার বিষয় — গ্রামীণ কৌম-জীবনের কোনো উৎসব-অনুষ্ঠানের উল্লেখ নেই জিতুর আটঘরার জীবনে। আছে কেবল পরিবারগত অনুষ্ঠানের কথা : 'এদের সত্যনারায়ণ পূজো ঘরের স্বচ্ছলতা বৃদ্ধির জন্যে, লক্ষ্মীপূজো ধনধান্য বৃদ্ধির জন্যে, গৃহদেবতার পূজো, গোপীনাথ জীউর পূজো — সবারই মূলে — হে ঠাকুর, ধনেপুত্রে যেন লক্ষ্মীলাভ হয় অর্থাৎ তা হ'লে তোমাকেও খুশী রাখবো।' এইসব পুজোর দিনে বাড়িতে যতই আনন্দ-উৎসব হোক, জিতু দেখে পুজোর বাসন মাজতে মাজতে তার মা আর বোনের প্রাণ ওষ্ঠাগত, বেলা দেড়টা পর্যন্ত না-খেতে-পেয়ে তার দাদা খাবার চাইতে গেলে বকুনির বান ডেকে যায় — 'এখনো বামুন-ভোজন হল না, দেবতার ভোগ রইল পড়ে, উনি এসেছেন ভোগের আগে পেরসাদ পেতে, — দেবতা নেই, বামুন নেই, ওর শুয়োর-পেট পোরালেই আমার স্বগ্‌গে ঘণ্টা বাজবে যে।' এসব দেখে শুনে এ জাতীয় অনুষ্ঠানের প্রতি জিতুর বিতৃষ্ণা আসাই স্বাভাবিক। আর এরকম অনুষ্ঠানগুলির কথাই সবচেয়ে ফলিয়ে বলেছে জিতু, যার থেকে সে জেনেছে :

> সত্যিই তো জ্যাঠাইমা পুণ্যবতী। নইলে তিনি ঠাকুরঘরে পবিত্র মনে এতক্ষণ জপ-আহ্নিক করছিলেন, আর মা মরছিলেন বেলা বারোটা পর্যন্ত গোয়াল-আস্তাকুড় ঘেঁটে ...। আমার মনে হ'ল ঠাকুরও শুধু বড় মানুষের জন্যে — নইলে মায়ের, ভাগ্নে বৌয়ের, ভুবনের মায়ের সময় কোথায় তারা নিশ্চিন্ত মনে, শুচি হয়ে, গরদ প'রে তাঁর পায়ে ফুলতুলসী দেবে?

ধর্মের এই ক্ষমতা-অন্বিত রূপটিই উপন্যাসের আলোচনা-বিষয় — জিতুর জ্যাঠামশাই-পরিবার তারই চিহ্নক। এর আরেকদিক হল কুসংস্কারের দিক — অসহায়ের প্রতি ক্ষমতাবানের অত্যাচারের অস্ত্র হল নানাবিধ ধর্মীয় কুসংস্কার। যুক্তিহীন অর্থহীন সেইসব কুসংস্কারের শাসনে শীতের দিনে একমাত্র পরিধেয় বস্ত্র গরম কোট সমেত পুকুরে ডুব দিতে হয় জিতুর দাদাকে, মাজা বাসন আবার মাজতে হয় জিতুর মাকে, জিতুর বাবার মৃতদেহ শ্মশানে নিয়ে যাবার লোক মেলে না। জিতু যে এই জ্যাঠামশাই-পরিবারের আশ্রিতদের উপর নানাবিধ অবিচার-অত্যাচার লক্ষ করে, গ্রামীণ একান্নবর্তী পরিবারের ভাঙন দেখানো তার উদ্দেশ্য নয়। সে শুধু দেখে অতি নিষ্ঠাবান ধর্মাচারীদের পুণ্য জীবনযাপনের ভিতরকার অমানবিক দিকটি। জিতুর গ্রামের অভিজ্ঞতা বিশেষ করে এই একটি পরিবারেরই অভিজ্ঞতা, যার সবটাই নঞর্থক। গ্রামের একটিমাত্র বস্তু তার কাছে ছিল সদর্থক — গাছের তলায় পড়ে থাকা অপূজিত ভাঙা পাথর খোদাই প্রাচীন একটি দেবমূর্তি। সেই অবহেলিত দেবমূর্তির করুণামাখানো মুখ জিতু চিরদিন মনে রাখে, সেই মুখ কখনো বা হয়ে ওঠে জিতুর ঈশ্বরের মুখ। এইভাবে, ধর্ম বিষয়ে আলোচনার সঙ্গে যুক্ত হয়েই নিশ্চিন্দিপুর কিংবা মনসাপোতার থেকে আটঘরা সম্পূর্ণ ভিন্ন হয়ে যায়।

ধর্মের ক্ষমতাতন্ত্রের আরও এক সংগঠিত ক্ষেত্র জিতুর প্রথম কর্মজীবন — ধর্ম যেখানে ব্যাবসা হয়ে অসহায় ভক্তদের শোষণের মাধ্যমে। নীলাম্বর রায় যার এস্টেটে কাজ পায় জিতু, তিনি একাধারে জমিদার এবং মঠের মহান্ত, সেই মঠের অধীনে গড়ে উঠেছে একটি ধর্মসম্প্রদায়, নীলাম্বর রায়ের পরিবার তাদের ধর্মগুরু। নীলাম্বর রায়ের পুত্ররা, যাদের সঙ্গে জিতুর আলাপ-পরিচয় হয়, তারা প্রত্যেকেই দাম্ভিক, মূর্খ, বিলাসী এবং অত্যাচারী। কার্তিক মাসে এঁদের মঠে যখন মহোৎসব

হয়, তখন এঁদেরই খাতায় জমা পড়ে বিশ্বাসী ভক্তদের দেয় মানত, পূজার প্রণামী এবং মহাস্নান নজরের টাকা। সেই টাকায় 'কলকাতায় ওঁদের স্ত্রীরা গহনা পরবেন, মোটরে চড়বেন, থিয়েটার দেখবেন, ওঁরা মামলা করবেন, বড়মানুষি সাহেবিয়ানা করবেন — ছোটবাবু বন্ধুবান্ধব নিয়ে গান-বাজনার মজলিসে চপ-কাটলেট ওড়াবেন ...।' অন্যদিকে সেই মহোৎসবে আসে নিমচাঁদের মতো মানুষও, যার 'মুখচোখের মুগ্ধ ভক্তি-স্তব্ধ দৃষ্টি দেখে মুগ্ধ হয় জিতু। খেটে-খাওয়া মানুষ নিমচাঁদ তার সামান্য সম্বল নিয়ে সস্ত্রীক পূজো দিতে আসে, কিন্তু ফিরে যায় না, কলেরায় মৃত্যু হয় তার, তার মত আরও অনেক মানুষের, কিন্তু মঠের মহান্তরা থাকে নির্বিকার, তাদের মুহুরিরা শুধু পাই-পয়সা মিলিয়ে টাকা নিতে জানে ভক্তদের কাছ থেকে, আর তাদের অন্য কর্তব্য নেই।'

এখানে কাজ করার সময়, কিংবা তার আগে কলেজে পড়ার সময়, জিতুর ধর্ম-বিষয়ে অভিজ্ঞতা নিয়ে উপন্যাসের ছোটো ছোটো এপিসোড গড়ে উঠেছে। 'অপরে কি ক'রে ধর্মানুষ্ঠান করে, তারা কি মানে, কি বিশ্বাস করে, এসব দেখে বেড়াতে আমার বড় ভালো লাগে' — বলেছে জিতু, আর এইভাবে দেখে বেড়িয়েছেও — 'হাওড়া পুলের ওপারে' মন্দিরে কিংবা কালীঘাটের মন্দিরে কিংবা বরানগরে কুঠির ঘাটে স্বামীজির কাছে। কিন্তু সে-সব জায়গায় তার মন সাড়া দেয়নি। তার ঈশ্বরের আকুতি জানিয়েছে রাস্তায় ভিখারিণীর কষ্ট দেখেই। জিতু বলেছে :

> তোমার মুখে অত করুণা মাখানো, মানুষকে এত কষ্ট দাও কেন? তা হবে না, তার ভালো করতেই হবে তোমায়, তোমার আশীর্বাদের পুণ্যধারায় তার সকল দুঃখ ধুয়ে ফেলতে হবে তোমাকে।

চাকরি ছেড়ে পথে বেরিয়ে পড়বার পর জিতুর আশ্রয় জোটে দ্বারবাসিনীর বৈষ্ণব আখড়ায় — ধর্মাচরণের আরেক রূপ সেখানে। নিয়মকানুনের ক্ষমতা-চাপ হয়তো সেখানেও দেখতে পেত জিতু, যদি না সেখানে কর্তৃত্ব করত মালতীর মতো মেয়ে, যার বাবা ছিলেন 'মুক্ত পুরুষ', 'কোন বাঁধন, কোন নিয়মাবলীর ধার ধারতেন না'। তবু, সেখানেও, বিগ্রহ নিয়ে পুতুল খেলাকে মেনে নিতে পারেনি জিতুর মন। যে-কোনো বিধিবদ্ধ ধর্মমতই তার কাছে প্রত্যাখ্যান-যোগ্য।

কিন্তু দ্বারবাসিনী পৌঁছোবার আগেই জিতুর 'একটা অপূর্ব নাম-না জানা অনুভূতির অভিজ্ঞতা' ঘটে যায়। খোলা আকাশের তলায় নদীর ধারের প্রান্তরে রাত্রিযাপন করতে করতে জিতুর মনে সেই অনুভূতির সঞ্চার হয় :

> আমার মনে সব ওলট-পালট হয়ে গেল, এমন এক দেবতার ছায়া মনে নামে — যেন জ্যাঠাইমার শালগ্রামশিলার চেয়ে বড়, আটঘরার বটতলায় সেই পাথরের প্রাচীন মূর্তিটির চেয়ে বড়, মহাপুরুষ খ্রীষ্টের চেয়েও বড় — চক্রবালরেখায় দূরের স্বপ্নরূপে সেই দেবতারই ছায়া, এই বিশাল প্রান্তরে ম্লান সন্ধ্যা রূপে মাথার ওপর উড়ে-যাওয়া বালিহাঁসের সাঁই সাঁই পাখার ডাকে ...

... আর মালতীর প্রতি গভীর ভালোবাসা বুকে নিয়ে তাকে ছেড়ে আসার পর, বটেশ্বরনাথ পাহাড়ে, গঙ্গায় স্নান করতে নেমে জিতুর মনে আবারও এক 'অপূর্ব ভাবের উদয়' হয়, যাকে আনন্দও বলতে পারা যায়, প্রেমও বলা যায়, ভক্তিও বলা যায়। সেদিন জিতু বোঝে :

হয়, তখন এঁদেরই খাতায় জমা পড়ে বিশ্বাসী ভক্তদের দেয় মানত, পূজার প্রণামী এবং মহান্তর নজরের টাকা। সেই টাকায় 'কলকাতায় ওঁদের স্ত্রীরা গহনা পরবেন, মোটরে চড়বেন, থিয়েটার দেখবেন, ওঁরা মামলা করবেন, বড়মানুষি সাহেবিয়ানা করবেন — ছোটবাবু বন্ধুবান্ধব নিয়ে গান-বাজনার মজলিসে চপ-কাটলেট ওড়াবেন ...।' অন্যদিকে সেই মহোৎসবে আসে নিমচাঁদের মতো মানুষও, যার 'মুখচোখের মুগ্ধ ভক্তি-স্তব্ধ দৃষ্টি দেখে মুগ্ধ হয় জিতু। খেটে-খাওয়া মানুষ নিমচাঁদ তার সামান্য সম্বল নিয়ে সস্ত্রীক পুজো দিতে আসে, কিন্তু ফিরে যায় না, কলেরায় মৃত্যু হয় তার, তার মত আরও অনেক মানুষের, কিন্তু মঠের মহান্তরা থাকে নির্বিকার, তাদের মুহুরিরা শুধু পাই-পয়সা মিলিয়ে টাকা নিতে জানে ভক্তদের কাছ থেকে, আর তাদের অন্য কর্তব্য নেই।'

এখানে কাজ করার সময়, কিংবা তার আগে কলেজে পড়ার সময়, জিতুর ধর্ম-বিষয়ে অভিজ্ঞতা নিয়ে উপন্যাসের ছোটো ছোটো এপিসোড গড়ে উঠেছে। 'অপরে কি ক'রে ধর্মানুষ্ঠান করে, তারা কি মানে, কি বিশ্বাস করে, এসব দেখে বেড়াতে আমার বড় ভালো লাগে' — বলেছে জিতু, আর এইভাবে দেখে বেড়িয়েছেও — 'হাওড়া পুলের ওপারে' মন্দিরে কিংবা কালীঘাটের মন্দিরে কিংবা বরানগরে কুঠির ঘাটে স্বামীজির কাছে। কিন্তু সে-সব জায়গায় তার মন সাড়া দেয়নি। তার ঈশ্বরের আকুতি জানিয়েছে রাস্তায় ভিখারিণীর কষ্ট দেখেই। জিতু বলেছে :

> তোমার মুখে অত করুণা মাখানো, মানুষকে এত কষ্ট দাও কেন? তা হবে না, তার ভালো করতেই হবে তোমায়, তোমার আশীর্বাদের পুণ্যধারায় তার সকল দুঃখ ধুয়ে ফেলতে হবে তোমাকে।

চাকরি ছেড়ে পথে বেরিয়ে পড়বার পর জিতুর আশ্রয় জোটে দ্বারবাসিনীর বৈষ্ণব আখড়ায় — ধর্মাচরণের আরেক রূপ সেখানে। নিয়মকানুনের ক্ষমতা-চাপ হয়তো সেখানেও দেখতে পেত জিতু, যদি না সেখানে কর্তৃত্ব করত মালতীর মতো মেয়ে, যার বাবা ছিলেন 'মুক্ত পুরুষ', 'কোন বাঁধন, কোন নিয়মাবলীর ধার ধারতেন না'। তবু, সেখানেও, বিগ্রহ নিয়ে পুতুল খেলাকে মেনে নিতে পারেনি জিতুর মন। যে-কোনো বিধিবদ্ধ ধর্মমতই তার কাছে প্রত্যাখ্যান-যোগ্য।

কিন্তু দ্বারবাসিনী পৌঁছোবার আগেই জিতুর 'একটা অপূর্ব নাম-না জানা অনুভূতির অভিজ্ঞতা' ঘটে যায়। খোলা আকাশের তলায় নদীর ধারের প্রান্তরে রাত্রিযাপন করতে করতে জিতুর মনে সেই অনুভূতির সঞ্চার হয় :

> আমার মনে সব ওলট-পালট হয়ে গেল, এমন এক দেবতার ছায়া মনে নামে — যেন জ্যাঠাইমার শালগ্রামশিলার চেয়ে বড়, আটঘরার বটতলায় সেই পাথরের প্রাচীন মূর্তিটির চেয়ে বড়, মহাপুরুষ খ্রীষ্টের চেয়েও বড় — চক্রবালরেখায় দূরের স্বপ্নরূপে সেই দেবতারই ছায়া, এই বিশাল প্রান্তরে ম্লান সন্ধ্যা রূপে মাথার ওপর উড়ে-যাওয়া বালিহাঁসের সাঁই সাঁই পাখার ডাকে ...

... আর মালতীর প্রতি গভীর ভালোবাসা বুকে নিয়ে তাকে ছেড়ে আসার পর, বটেশ্বরনাথ পাহাড়ে, গঙ্গায় স্নান করতে নেমে জিতুর মনে আবারও এক 'অপূর্ব ভাবের উদয়' হয়, যাকে আনন্দও বলতে পারা যায়, প্রেমও বলা যায়, ভক্তিও বলা যায়। সেদিন জিতু বোঝে :

না এলে কষ্ট হয়, অভিমান হয় — এগারো-বারো বছরের বালকের মনে প্রেমের অনুভব বর্ণনার পক্ষে এই তো যথেষ্ট, যদিও সে জানে না তখন, প্রেম কাকে বলে। যৌবনে কলেজে পড়ার সময় শৈলদির বাড়িতে যখন আশ্রিত, তখন ওই বাড়ির ছোটো বউ সম্পর্কে জিতুর মনে স্পষ্ট প্রেমানুভবের সঞ্চার :

> কি অপূর্ব ধরনের আনন্দ বেদনায় মাখানো দিন, সপ্তাহ, পক্ষ, মাস। ... অথচ যার চিন্তা শয়নে স্বপনে সর্বদাই করি, পাছে তাঁর সামনে পড়ি এই ভয়ে সতর্ক হয়ে চলাফেরা করি।

এই ছোটো বউঠাক্‌রুণের রূপ কখন কীভাবে জিতুর চোখে ধরা পড়েছে — তার বিবরণ বেশ খুঁটিয়ে দিয়েছে জিতু। পরিণতিহীন এই প্রেমানুভব অবশ্য স্বল্পজীবীই। দূরে চলে গিয়ে জিতু এঁর কথা ক্বচিৎ কখনো ভেবেছে — এই পর্যন্ত। এরপর মালতীর সঙ্গে দেখা হয় জিতুর, যাকে উপন্যাসের নায়িকা বলা যেতে পারে। *শ্রীকান্ত*-র কমললতার সঙ্গে *দৃষ্টিপ্রদীপ*-এর এই মালতীমালার সাদৃশ্য সমালোচকেরা সকলেই লক্ষ করেছেন, এমন হতেও পারে যৌবনবতী কুমারী মেয়ে তখনকার গ্রামসমাজে বৈষ্ণব আখড়া ছাড়া অন্যত্র দুর্লভ ছিল বলেই বিভূতিভূষণকে শরৎচন্দ্রের অনুসরণ করতে হয়েছে। কিন্তু কমললতার মতো প্রেমবিহ্বলা আদৌ নয় মালতী। বস্তুত জিতু শেষ পর্যন্ত নিশ্চিন্ত হতে পারেনি মালতীর মনোভাব সম্বন্ধে, তাদের স্পষ্ট কোনো প্রেম-বিনিময় ঘটেনি।

মালতীর প্রতি জিতুর প্রেমানুভব ঐশ্বরিক উপলব্ধির সমান মর্যাদা পেলেও মালতীকে ভুলে গিয়ে কিশোরী মেয়ে হিরণ্ময়ীকে ভালোবাসতে খুব বেশিদিন সময় লাগেনি জিতুর। *শেষের কবিতা*-র ঘড়ার জল তার পুকুরের জলের অনুরূপ কোনো তত্ত্ব কি বিভূতিভূষণ উপস্থিত করতে চেয়েছিলেন সচেতনভাবে? নাকি, বিভূতিভূষণের দিনলিপির সাক্ষ্য থেকে যেমন জানা যায়, একই সময়ে দুই নারীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার যে অভিজ্ঞতা ঘটছিল তখন তাঁর জীবনে, তারই ছায়াপাত ঘটেছে তাঁর উপন্যাসেও?*

চার

তাহলে প্রশ্নটি পুরোপুরি তোলাই ভালো বিভূতিভূষণ নিজে কতটা উপস্থিত তাঁর এই উপন্যাসে। অপুর জীবনবৃত্ত যেমন অনেকাংশেই বিভূতিভূষণের নিজের জীবনবৃত্তের অনুরূপ, জিতুর ক্ষেত্রে তেমন নয়। অর্থাৎ আখ্যানের নায়ক জিতুই, বিভূতিভূষণ নন। কিন্তু আখ্যানের কথক কোনো বিশেষ চরিত্র হলেও আলোচনার কর্তৃকারক তো অবশ্যই লেখক, সেদিক থেকে জিতুর কণ্ঠে দ্বিস্বর থাকাই স্বাভাবিক ছিল। আলোচনার কর্তাকেও বিভূতিভূষণ নিজের থেকে পৃথক করার প্রয়াস যে করেছিলেন, তা বোঝা যায় খ্রিস্টধর্মের প্রসঙ্গ-ব্যবহারে — উপন্যাসের আলোচনার জন্যে সে-প্রসঙ্গ আবশ্যিক ছিল না। যিশুর প্রতি অনুরাগ ছাড়াও কোনো বোধদীপ্ত বালকের কাছে সম্প্রদায়গত ধর্মাচরণের বা সেই সংক্রান্ত নানাবিধ কুসংস্কারের অর্থহীনতা স্পষ্টই হতে পারে।

---

*'জীবনে তখন সুখ ছিল, সে অন্যরকম। আর এখন এ অন্যরকম। তখন জীবন ছিল নির্জন, এখন খুকু এসেচে, সুপ্রভা এসেচে।' — *উৎকর্ণ*

এই প্রয়াস সত্ত্বেও কিন্তু জিতু মূলত বিভূতিভূষণ থেকে ভিন্ন আর কোনো স্বর পায় না। 'আর যাঁকে ভগবান বলা হয় তিনি কি বিরাট। আমি এই ভগবানকে জানতে চাই। কালী, দুর্গা গ্রাম্য দেবতা। এই মহান বিরাটতার সঙ্গে খুকুর কমনীয়তা, গ্রাম্য ঘেঁটুবনের সৌন্দর্য সবই তিনি সৃষ্টি করেছেন এমনকি Spirit world-এর cosmic ether-এর সমুদ্র পর্যন্ত।'*

দৃষ্টিপ্রদীপ রচনাকালীন দিনলিপির এই উদ্ধৃতি থেকে বোঝা যায় জিতুর উপলব্ধি বিভূতিভূষণেরই উপলব্ধি। জিতুকে বিভূতিভূষণ অভিন্ন না করতেই চেয়েছিলেন হয়তো, আত্মজীবনের ছায়াপাত ঘটেছে মাত্র দুটি-তিনটি এপিসোডে, তবু জিতু লেখকের 'আমি'ই থেকে গেছে, 'তুমি' হয়ে উঠতে পারেনি — যে 'তুমি' 'আমি'রই সমান এক দ্বিতীয় সত্তা। এর কারণ বিভূতিভূষণের দ্বিস্বরিক রচনার অক্ষমতা নয়, এর কারণ উপন্যাসটিতে আখ্যান আর আলোচনা অভিন্ন হয়ে ওঠেনি, যেমন হয়েছে *চতুরঙ্গ*-তে, আখ্যান এখানে আলোচনাকে অনুসরণ করেছে — এইমাত্র।

আলোচনার কর্তৃকারক হিসেবে লেখক তো উপন্যাসে উপস্থিত থাকবেনই। কিন্তু আলোচনার সঙ্গে সম্পর্কিত অথচ অতিরিক্ত একটি দিক আছে *দৃষ্টিপ্রদীপ*-এ যেখানে বিভূতিভূষণ সরাসরি উপস্থিত। *দৃষ্টিপ্রদীপ* নামটি উপন্যাসের সেই বিশেষ দিকটিকেই নির্দেশ করেছে। ছোটোবেলা থেকে জিতু নানারকম অতিলৌকিক দৃশ্য দেখত মাঝে মাঝে, তার সেই ক্ষমতাই ব্যঞ্জিত হয়েছে *দৃষ্টিপ্রদীপ*-শব্দবন্ধে। কিন্তু খুব সংগতভাবেই লক্ষ করেছিলেন জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র — 'Clairvoyance-টা অবান্তরই থেকে গেল।' জিতুর ব্যক্তিগত ধর্ম চেতনার উন্মেষে তার এই দৃষ্টি ক্ষমতা কোনো উপাদান জোগায়নি। বরং তার পরম উপলব্ধির মুহূর্তে জিতু বলেছে :

> আমি যা হারিয়েছি তা আর চাই নে, আমি চাই আজকার সন্ধ্যার মত আনন্দ, এবং যে নতুন দৃষ্টিতে এই এক মুহূর্তের জন্যে জগৎটাকে দেখেছি সে দৃষ্টি হারিয়ে যাবে জানি, সে আনন্দ জীবনে অক্ষম হবে না জানি — কিন্তু আর একবারও যেন অন্ততঃ তারা আসে আমার জীবনে।

যা হারিয়েছে বলে ভাবছে জিতু — সে তো তার সেই অলৌকিক ক্ষমতা। তার সেই অলৌকিক দৃষ্টিতে জিতু দেখত নানারকম দৃশ্য। কখনো দেখত — আকাশের গায়ে ভেসে-ওঠা অজানা এক অপার্থিব দেশের ছবি, কখনো দেখতে পেত মৃত মানুষদের, কখনো বা দেখত অনেক দূরের

---

*এ ধরনের আরও কয়েকটি উদ্ধৃতি :

১। 'কি নীলকৃষ্ণ মেঘ, কি বিদ্যুৎ, মাধবপুরের চরের শ্যামলতা আমার উপাসনা ঐ ঝোড়ো মেঘে — দুহাত তুলে আনন্দে প্রায় নাচি আর কি। অমন কালবৈশাখীর রূপ মনের মধ্যে যে-ভাব জাগায় দেবতার আশীর্বাদের মত তা আসে।' ২২ মে ১৯৩৪

২। 'চির সুন্দরের সঙ্গে, নারীর সঙ্গে, প্রকৃতির সঙ্গে ভুবনে ভুবনে কি আশ্চর্য আনন্দ সম্বন্ধ রয়েচে। ওদের মুখের হাসি — সে চিরসুন্দরের দান — বৃষ্টি — এই নীল আকাশ, এই সুন্দর জল, বাঁশবন, তার মধ্যে স্নেহ প্রেম সেবা দয়া — এরা আছে বলেই এ পৃথিবীই সুখ!'

কোনো ঘটনা। কখনো বা সে অনুভবে জানতে পারত কোনো বিশেষ বিগত মানুষের উপস্থিতি।

তার এই বিশেষ ক্ষমতার কোনো দিক থেকেই কোনো অপরিহার্যতা নেই — না আখ্যানের দিক থেকে না আলোচনার দিক থেকে। একমাত্র ভাবা যেতে পারে জিতুকে, উপন্যাসের কথককে, অন্যদের থেকে উঁচুদরের মানুষ হিসেবে প্রতিষ্ঠা দিতে চাওয়ার হয়তো বা একটা কৌশল এটা। বিশেষত, আখ্যান যেখানে শুরু হয়েছে, সেখানে তো জিতু বালক মাত্র, অথচ তার জনাবিতেই আলোচনা পেশ করতে হচ্ছে লেখককে, সে ক্ষেত্রে কোনো একদিক দিয়ে তার অসাধারণত্ব প্রতিপন্ন করার দায় ছিল হয়তো লেখকের। কিন্তু মনে হয় না এইটেই একমাত্র কারণ। *দৃষ্টিপ্রদীপ* লেখা শুরুর কিছু আগে থেকেই যে বিভূতিভূষণ 'প্রেততত্ত্ব' কিংবা 'Spiritualism' নিয়ে রীতিমতো মেতে উঠেছেন, তার প্রমাণ মেলে তাঁর দিনলিপি থেকে। 'Spiritualism' — সংক্রান্ত বই পড়ছেন, সেইসব পড়াশুনা সূত্রেই তাঁর আগ্রহ জন্মায় Psycho-cognition বিষয়ে। 'Clairvoyance' কিংবা 'Crystal-vision' কিংবা দেশগত কালগত বহু দূরের ঘটনা জানতে পারা — সবই হল Psycho-cognition-এর বিশেষ বিশেষ রূপ। জিতুর দৃষ্টিক্ষমতার মধ্যে Psycho-cognition-এরই ভিন্ন ভিন্ন দিক দর্শিয়েছেন বিভূতিভূষণ — অলৌকিকতার প্রতি তাঁর নিজের বিশ্বাসে পাঠকদেরও বিশ্বাসী করে নিতে চেয়েছেন।

আখ্যানে দেখি — যতই বয়স বাড়ে ততই জিতুর অলৌকিক ক্ষমতা কমতে থাকে একটু একটু করে। কিন্তু পরিণত জিতুর তথা বিভূতিভূষণেরও ঈশ্বর চেতনাতে থেকে যায় কোনো এক অতিলোকের ছায়া। 'সকল মন্দিরের বাইরে/আমার পূজা আজ সমাপ্ত হলো/দেবলোক থেকে মানবলোকে/আকাশে জ্যোতির্ময় পুরুষে/আর আমার মনের মানুষে আমার অন্তরতম আনন্দে' — রবীন্দ্রনাথের এই ধর্মবোধের সঙ্গে বিভূতিভূষণের ধর্মবোধের অনেকাংশে সাদৃশ্য থাকলেও এইদিক থেকে তিনি পৃথক। বালক জিতু আকাশে যে অতিলোকের দৃশ্য দেখতে পেত তার চর্মচক্ষুতেই, তার থেকে আরও মহান দৃশ্য দেখেছে সে অধ্যাত্ম উপলব্ধির মুহূর্তের মানস দৃষ্টিতে :

> গ্রহে গ্রহে নক্ষত্রে নক্ষত্রে কত দৃশ্য-অদৃশ্য লোক, কত অজানা জীবজগতেও এরকম বেদনা, দীনতা, দুঃখ। দূরের সে-সব অজানা লোকে ক্ষুদ্র গ্রাম্য নদী দীর্ঘ বটগাছের ছায়ায় বয়ে যায়, তাদের শান্ত বনবীথির মূলে প্রিয়জনের, বহুদিন-হারা প্রিয়জনের কথা ভাবে — নদীর স্রোতে শেওলা-দাম-ভাসা জলে অনন্তের স্বপ্ন দেখে — যে অনন্ত তার চারধারে ঘিরে আছে সবসময়, তার নিঃশ্বাসে, তার বুকের অদম্য প্রাণস্রোতে, তার মনের খুশিতে, নাক্ষত্রিক শূন্যপারের মিটমিটে তারার আলোয়।

দেশের কালের অনন্তের বোধ এইভাবে বিভূতিভূষণ অভিলোকের কল্পনা দিয়ে ভরিয়ে দিতে ভালোবাসেন। *দৃষ্টিপ্রদীপ*-এ তার প্রস্তাবনা, সে অভিলোক কল্পনাকে মূর্ত করেছেন তিনি *দেবযান* উপন্যাসে।